Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume –2, Issue-iii, published on July 2022, Page No. 305–313
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

নির্জন সরস্বতী : নারীর অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের সাধনা

ড. শ্রেয়া রায়
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
দুর্গাপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়
ই-মেইল : shreyaray.dgcbengali@gmail.com

তনয়া দাস
স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ
প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

Keyword
নারীবাদ, যৌথ পরিবার, একাকীত্ব বোধ, একবিংশ শতক, বন্ধ্যাত্ব, স্বাবলম্বী, দাম্পত্য সংকট

Abstract
তিলোত্তমা মজুমদারের 'নির্জন সরস্বতী' উপন্যাসে নারীর অন্ধকার থেকে আলোর পথে যাত্রা তথা উত্তরণের সাধনাকে বিশেষরূপে দেখানো হয়েছে। এই উপন্যাসের মূল চরিত্র দেবাদৃতা একদিকে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং অন্যদিকে স্বামীকে সুস্থ করে তুলতে প্রতিনিয়ত নিত্যনতুন লড়াইয়ের সম্মুখীন হয়েছে। তবু সে হার মানেনি। বরং নিজের সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে জীবনতরী এগিয়ে নিয়ে চলেছে। তার জীবনের প্রবাহ পথে এসেছে তার মা, দিদি, ঠাকুমা, জেঠিমা, পরিচারিকা, রাজর্ষির মা ইত্যাদি নারী চরিত্র। লেখিকা প্রত্যেকটি চরিত্রে তাদের জীবনের বিশেষ বিশেষ দিককে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাদের জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে এসেছে সমাজের চিত্র, সমাজে নারীর অবস্থান, যৌথ পরিবারের ধনাত্মক ও ঋণাত্মক দিক, সম্পর্কের স্বরূপ, নারীর লড়াই, জীবনদর্শন এবং জীবন সাধনার নানা প্রসঙ্গ। উপন্যাসে নারীর অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের সাধনা বড়ো হয়ে উঠেছে।

Discussion
"জীবনের কঠিন পরীক্ষায় 'হার যে মানে না, তাকে কি হারাতে পারে কেউ?"[১]

এই ভাবনাকেই সাহিত্যে রূপ দিয়েছেন বিংশ শতকের অন্যতম সাহিত্যিক তিলোত্তমা মজুমদার তাঁর 'নির্জন সরস্বতী' উপন্যাসে। যেখানে একজন নারী দু-টি ভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নিজে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে নিজের ভিত্তিভূমি তৈরি করেছে। উপন্যাসটি শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় ১৪২৫ বঙ্গাব্দে (২০১৮ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়। বইটি প্রকাশিত হয়েছে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে এবং প্রচ্ছদ এঁকেছেন রৌদ্র মিত্র। এই উপন্যাসে দেবাদৃতা অসফলতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে হতে অন্তরাত্মার ডাক শুনেছিল। জীবনের পরিবর্তন অনুযায়ী নিজেকে যেমন প্রস্তুত করেছিল দেবাদৃতা। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সওদাগরের নৌকা' নাটকের প্রসন্নর মতো শুনেছিল-

"সওদাগর নৌকা ভাসাও'- এখানে হারলেও জিত, জিতলেও জিত।"[২]

দেবাদৃতা ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার সমুদ্রে নৌকা ভাসিয়ে ভেবেছিল– সে কোনোভাবেই হার মানবে না। সে সফল হবে। পূর্বাপর নিরবচ্ছিন্নভাবে ব্যর্থতা বা সফলতা বলে কিছু হয় না। দেবাদৃতা উপলব্ধি করেছিল স্থবিরতায় মৃত্যু এবং চলমানতাই হল জীবন। তিলোত্তমা মজুমদার দেবাদৃতার জীবন সাধনাকে উপন্যাসের আধারে একাধিক ঘটনা পরম্পরায় রূপ দিয়েছেন। জীবনের সাধনায় সফলতার মতোই আসতে পারে ব্যর্থতা। সেই সফলতা বা ব্যর্থতাকে পাথেয় করেই মানুষ নির্জনে একা অগ্রসর হয় সাধনায় সিদ্ধিলাভের উদ্দেশ্যে। দেবাদৃতার অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের যাত্রাপথই এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়।

উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র দেবাদৃতা রায়। যার ডাকনাম দেবু। শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত রায় পরিবার পুরোনো বালিগঞ্জে নিজেদের জায়গায় তৈরি বিরাট ইমারতের নয় তলার চারটি ফ্ল্যাটে থাকে। তিনটি ফ্ল্যাটে দেবাদৃতার বাবা, জেঠু ও কাকা থাকে এবং চতুর্থটিতে লাইব্রেরি ও অতিথিদের জন্য ঘর আছে। দেবাদৃতার পরিবারে সকলেই শিক্ষিত এবং শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত। এইরকম একটি সুন্দর যৌথপরিবারে দেবাদৃতার জীবন বিষাক্ত করে দিয়েছিল তার সি.এ পরীক্ষায় ব্যর্থতার গ্লানি। সেই ব্যর্থতায় যেমন তার জীবনের খুশি চলে গিয়েছিল তেমনই ম্রিয়মান হয়ে পড়েছিল তার পরিবার। তার জীবনের খুশি নিয়ে আসার জন্য তার পরিবার রাজর্ষি দাশগুপ্ত নামে এক অধ্যাপকের সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধ করেছিল। দেবাদৃতার মনে হয়, সেই বিয়ে তার ব্যর্থতাকে ঢাকা দেওয়ার প্রচেষ্টা মাত্র। সমাজে মেয়েদের ব্যর্থতাকে ঢাকা দেওয়ার একটি পন্থা হল বিয়ে। সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, অনেক সময় 'বিয়ের বয়স' নামক শব্দটি মেয়েদের সাফল্যের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। দেবাদৃতা পুনরায় পরীক্ষায় পাশ করার জন্য বন্ধুদের সঙ্গে সুভাষগ্রামে অসীমচন্দ্র চৌধুরীর বাড়িতে যায়। সেখানে কাকতালীয়ভাবে সাক্ষাৎ ঘটে রাজর্ষি এবং দেবাদৃতার। জীবনে প্রথমবার দু-জনেরই দু-জনকে দেখে নিজের মধ্যে এমন এক অনুভূতি হয় যা অনির্বচনীয় এবং ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

পরিবারের কথা মতো তাদের বিবাহ হয়। সুখে-শান্তিতে-আনন্দে কাটে বিয়ের প্রথম তিনদিন। উপন্যাসের এতদূর পর্যন্ত কাহিনি সাধারণ। পাঠকের মনে হতে পারে এখানেই উপন্যাসটি শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু লেখিকা পাঠককে চমকে দিয়েছেন এরপরের অংশে। এই পরবর্তী অংশটিকে উপন্যাসের ক্লাইম্যাক্স বলা যেতে পারে। বিয়ের পরবর্তী তিন রাত্রি তারা কেউই কামার্ত হয়ে ওঠেনি। বরং দু-জন দু-জনকে দিয়েছে যত্ন, ভালোবাসার অনুভূতি। চতুর্থ রাত্রিতে তারা যৌন সম্পর্কসুখের গভীরে প্রবেশ করে এবং তারপরেই উন্মাদের মত ব্যবহার করে রাজর্ষি। তার এইরকম আচরণের পেছনে ছিল তার পরিবারের কিছু ভয়ঙ্কর স্মৃতি। দেবাদৃতার জীবনে আসে দু-টি লড়াই। একদিকে সি.এ পরীক্ষায় পাশ করার সাধনা, অন্যদিকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত স্বামীকে সুস্থ করে তোলার সাধনা। সে জীবনের দু-টি লড়াইকে একটি লড়াই হিসেবে গ্রহণ করে। লেখিকা দেখিয়েছেন একজন নারী নিজেকে স্বপ্রতিষ্ঠিত করার লড়াই যেমন করেছে, তেমনি অসুস্থ স্বামীকেও ত্যাগ করেনি। বরং কঠিন পরিস্থিতিতে সাধনার মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করে তুলেছে। শেষপর্যন্ত লেখিকা জীবনের লড়াই-এ দেবাদৃতার হার বা জিত দেখাননি। বরং তিনি তাঁর লেখনীর সাহায্যে দেবাদৃতার জীবনের লড়াইকে বিশেষভাবে যত্ন করে ফুটিয়ে তুলেছেন।

অনেক সময় জীবনে হেরে যাওয়া বা জিতে যাওয়ার থেকেও বড়ো হয়ে ওঠে চেষ্টা করার অদম্য ইচ্ছে। তাই লেখিকা যেখানে উপন্যাসের শেষ করেছেন, সেখানে পাঠকের মনে কিছুটা অতৃপ্তি হয়তো থেকে যায়। তবে জীবনের লড়াই-এ দেবাদৃতা হেরে যাবে, না জিতে যাবে, সেটাই এই উপন্যাসে বিশেষত্ব। দেবাদৃতার হার না মানার চেষ্টার দিকে তাকিয়েই পাঠক অবলীলায় তা কল্পনা করে নিতে পারে। এই কাহিনি শুধুমাত্র দেবাদৃতার নয়। প্রত্যেকটি মানুষ প্রতিনিয়ত তাদের জীবনে বিভিন্ন ধরনের লড়াই করে চলে। সেই লড়াই করে এগিয়ে যাওয়ার প্রগতিকেই লেখিকা গুরুত্ব দিয়েছেন এই উপন্যাসে। তবে এ কথা উল্লেখ্য যে, দেবাদৃতার যে ছেলেকে পছন্দ হয়েছিল তার সঙ্গেই বাড়ির লোক বিয়ের সম্বন্ধ করেছিল– এই রকম ঘটনা সমাজে খুব কম দেখতে পাওয়া যায় বা দেখা যায় না বলা চলে।
উপন্যাসে দেবাদৃতার নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লড়াই এবং স্বামীকে সুস্থ করে সুখী দাম্পত্য গড়ে তোলার লড়াই একই সঙ্গে সমান্তরালভাবে এগিয়ে চলেছে। তবে দেবাদৃতা ছাড়াও আরও একগুচ্ছ নারীর সমারোহ এই উপন্যাসে

ঘটেছে। লেখিকা সেই বৈচিত্র্যপূর্ণ নারীদের বিভিন্ন দিককে ফুটিয়ে তুলেছেন। দেবাদৃতার মা গবেষক হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা করতে পারেননি। কিন্তু তার পরিবর্তে জীবনের প্রত্যেক মুহূর্তে তিনি কিছু না কিছু আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। গণিত তার জীবনসত্তার সঙ্গে মিলেমিশে গিয়েছে। দেবাদৃতার জেঠিমা ডাক্তারি পাশ করে বিবাহিত অবস্থায় চাকরি করার জন্য প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। দেবাদৃতার দিদি অপরাজিতা মনোরোগীর চিকিৎসা করার সিদ্ধান্ত নিলে উপহাসের পাত্রী হয়েছেন। তা সত্ত্বেও সেই পেশা গ্রহণ করেছেন, স্বামীর সবসময়ের সঙ্গী হয়েছেন। দেবাদৃতার ঠাকুমা মেয়েদের চাকরির অন্তরায় তৈরি করলে পিসি ঠাকুরমা সেই দরজা খুলে দিয়েছেন। তার বাড়ির পরিচারিকা অমিয়াও তাদের পরিবারের সদস্য হয়ে উঠেছে। সে নিজে কাঁথা সেলাই করে অর্থাৎ শিল্পীসত্তার প্রকাশ তার মধ্যে ঘটছে। দিদিমা ঠাকুরমা সংসারের চাপে ছবি আঁকা ত্যাগ করেছেন। কিন্তু তার সেই ইচ্ছের কথা পরবর্তী প্রজন্মকে জানানোর সাহস দেখিয়েছেন। অন্যদিকে নারী মানেই সে যে স্নিগ্ধ মাতৃরূপা কোমল হৃদয়ের হয় না তার প্রমাণ রাজর্ষির মা, যে মা-ছেলের বিকারগ্রস্থতার কারণ হয়ে ওঠে। এইভাবে একাধিক নারী এই উপন্যাসে নিজের ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর শিকাগো ধর্ম-মহাসভায় বিবেকানন্দের (১৮৬৩ - ১৯০২) কণ্ঠে উচ্চারিত হয় –

> "As the different streams having their sources in different paths which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to Thee."[৩]

বিভিন্ন উৎস থেকে উৎসারিত বিভিন্ন পথগামী নদী যেমন পূর্ণতা পায় সুমদ্রের সঙ্গে মিলনে, তেমনি বিভিন্ন রকমের মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হয়ে অর্থাৎ জীবনের সত্য উপলব্ধি করে জীবনে সৌন্দর্য খুঁজে পায়। অনেক সাধনার পরে প্রাপ্ত সেই মিলনে থাকে সুখ-শান্তি। একই আত্মানুসন্ধান পরিলক্ষিত হয় তিলোত্তমা মজুমদারের 'নির্জন সরস্বতী' ও 'একতারা' উপন্যাসে। দু-টি উপন্যাসে যথাক্রমে দেবাদৃতা ও দেবারতি তাদের অন্ধকার জীবনের মধ্যে গতিপথ খুঁজে পেয়েছিল আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে। এখানে আত্মোপলব্ধি জীবনে সুখ-শান্তি পাওয়ার পন্থা। 'একতারা' উপন্যাসে দেখা যায়, বারবার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে মানুষ কীভাবে অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। দীর্ঘদিনের অশান্তির পরে শেষপর্যন্ত দেবারতি আবিষ্কার করে নিজেকে। সে উপলব্ধি করে তার স্বপ্নের জগৎ সৃষ্টি করতে পারে তার হাতের লেখনী। দু-টি উপন্যাস যদি পাশাপাশি রাখা যায়, তবে বলা চলে উপন্যাস দু-টি যেন পয়সার এ-পিঠ ও ও-পিঠ। দেবাদৃতার প্রেমের সাফল্য ও দেবারতির প্রেমের অসাফল্য তাদের আত্মোপলব্ধিতে সহায়তা করেছে। আত্মোপলব্ধি তারা দু-জনেই করেছে, পার্থক্য শুধুমাত্র তাদের জীবনের মার্গ দু-টির। দু-জন মানুষের পারিবারিক অবস্থা, মানসিক অবস্থা, সমস্যা, জীবনযাত্রা ভিন্ন হলেও তারা একই গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলে; ঠিক মোহনার দিকে ধাবমান দুটি ভিন্নরূপী নদীর মতো। তিলোত্তমা মজুমদারের অন্যান্য উপন্যাসগুলিতেও যেমন 'বসুধারা', 'রাজপাট', 'চাঁদের গায়ে চাঁদ', 'শামুকখোল' ইত্যাদি, প্রায় প্রত্যেকটি উপন্যাসেই নারী, নারীর মনস্তত্ত্ব এবং সমাজের নানা দিক ফুটে উঠেছে।

'নির্জন সরস্বতী' উপন্যাসে দেবাদৃতার জীবনের লড়াই-এর কথা প্রসঙ্গে তিলোত্তমা মজুমদার যৌথপরিবারের আলোকিত এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন উভয় দিকটিকেই সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। দেবাদৃতার পরিবারকে দেখে বোঝা যায়, যৌথপরিবারের মানুষগুলি ভালো হলে কীভাবে পরস্পরের সহযোগিতায়, সহমর্মিতায়, ভালোবাসায় সকলের জীবন সুখ ও শান্তিতে ভরে ওঠে। সেখানে দেবাদৃতা বারবার পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়ার পরেও তার পরিবার তাকে এগিয়ে যাওয়ার সাহস দেয়। পরিবারের কিছু সদস্য তাকে তার ভুলগুলো যেমন ধরিয়ে দেন, তেমনি কিছু সদস্য মনে করেন সে কোনো ভুল করেনি। সকলে সকলের মতকে গুরুত্ব দেন এবং একে-অপরের জীবন সাজানোর কর্মে যোগদান করেন। অন্যদিকে যৌথ পরিবারের ভয়ঙ্কর রূপ ফুটে উঠেছে রাজর্ষির পরিবারের রূপায়িত চিত্রে। সেখানে রাজর্ষির মা ও জেঠুর অবৈধ সম্পর্কের কারণে তার বাবা আত্মহত্যা করেন, জেঠি পাগল হয়ে যান এবং আট বছর থেকে এগারো বছর বয়স পর্যন্ত রাজর্ষি মানসিকভাবে অত্যাচারিত হতে হতে রোগীতে পরিণত হয়। বিয়ের পরে তার মানসিক ভারসাম্যহীনতা প্রকাশের ফলে তাদের জীবনযাপন ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পরিবার একটি শিশুর ভিত্তিভূমি। শিশু রূপ মাটির পিন্ডকে মূর্তিতে রূপ দেওয়ার প্রধান কারিগর মা-বাবা তথা পরিবার ও পরিবেশ। শিশুর শারীরিক ও মানসিক গঠন নির্ভর করে এইগুলির ওপরে। যৌথপরিবারের ইতিবাচক ও নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের ফলে গড়ে ওঠা দু-জন মানুষের জীবনকে লেখিকা দেখালেন এই উপন্যাসে। একইসাথে দেখালেন যৌথপরিবারগুলির ইতিবাচক মানসিকতা যখন লুপ্ত হতে থাকে তখন কীভাবে সম্পর্কগুলি পুরনো বাড়ির মতো ধ্বংসাবশেষের রূপ নেয়। বর্তমানের একটি জনপ্রিয় রোগ হলো একাকীত্বতা। কিন্তু একবিংশ শতকের প্রথম দিকে বা তার আগে এই ব্যাধির ঔষধ ছিল যৌথপরিবারগুলি। যেখানে অনেক মানুষের উপস্থিতির কারণে পরিবারের কিছু কিছু সময় ঝামেলা হলেও প্রত্যেকটি সদস্য ছিল একে-অপরের সঙ্গী। সেখানে একাকীত্ব বোধ কারো জীবনে চিরস্থায়ী রূপে বসবাস করতে পারত না।

লেখিকা এই উপন্যাসে শুধুমাত্র একজন মেয়ের জীবনের লড়াই-এর কথা বলেননি, একইসঙ্গে মেয়েটির জীবনের সঙ্গে জড়িত সমাজের কথা বলেছেন। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নারী-পুরুষের নানা সামাজিক সমস্যাকে দেখিয়েছেন। সমাজে অনেক সময় দেখা যায় মেয়েরা কী ধরনের চাকরি করবে তা ঠিক করে দেয় তাদের পরিবার, বা বিয়ের পরে মেয়েদের চাকরির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয় তার শ্বশুরবাড়ির সদস্যগণ। অথচ যে মেয়েটি কষ্ট করে পড়াশোনা করে বা চাকরি পায় সমাজে তার মতামতের কোন মূল্য থাকে না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের (১৯১৬-১৯৭৫) 'অবতরণিকা' গল্পের জেদি, সাহসিনী, আত্মতেজে বলীয়ান আরতির নাম। সংসারের প্রয়োজনে যাকে ঘরের লক্ষ্মীরূপের পাশাপাশি গ্রহণ করতে হয়েছিল অন্নপূর্ণার রূপ। কিন্তু যখন তার চাকরি করার প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়, তখন তার স্বামী তথা শ্বশুরবাড়ির সকলে চায় আরতিকে আবার গৃহবন্দি করতে। শেষপর্যন্ত অন্যায়ের প্রতিবাদ স্বরূপ সে পদত্যাগ করলে, সেই স্বামী তথা শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা তাকে অপমান করে। এইরকম কত মেয়ে রয়েছে, যারা বাধ্য হয়ে নিজেদের স্বপ্নের জলাঞ্জলি দেয়। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও বিবাহিত হওয়ার কারণে তারা ইচ্ছানুযায়ী নিজেদের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারে না। সমাজ ছেলে-মেয়েদের ভাগ করে দেয় তাদের খেলার সরঞ্জাম, পড়াশোনার বিষয়, এমনকি ভাবনা-চিন্তার পরিধিও। তবু সমাজে কিছু মানুষ থাকে যারা ব্যতিক্রমী পরিচয় দিয়ে সমাজের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে যায়। বৃহত্তর সমাজের এই বিষয়টিকে তিলোত্তমা মজুমদার দেবু, দেবুর মা, জেঠি প্রভৃতি চরিত্রের মধ্য দিয়ে দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। সমাজের এইরূপ আচরণ দেখে মনে হয়, যেন আকাশে ওড়ার আগেই পাখিকে খাঁচায় বন্দী করা হয়েছে। ফলস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দুই পাখি' কবিতার মতো বনের পাখি রূপ বিশ্বজগতের সঙ্গে খাঁচার পাখি রূপ নারী একাত্ম হতে পারে না।

সমাজে অনেক আগে থেকে মনে করা হয় কুমারীকালে নারীকে পিতার, যৌবন কালে স্বামীর, বার্ধক্যে পুত্রের অধীনে থাকা উচিত; নারীর স্বাধীন সত্ত্বা থাকা উচিত নয়। ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকেও নারীর এই অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। 'আমার জীবন' আত্মজীবনীর লেখিকা রাসসুন্দরী দাসীকে (১৮১০-১৮৯০) ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে স্বচেষ্টায় পড়াশোনা শিখতে অনেক লড়াই করতে হয়েছিল। সেই সময় মেয়েদের শিক্ষিত হওয়ার ইচ্ছেকে পাপ বলে মনে করা হত। মেয়েদের কাজই ছিল সকলের সেবা-যত্ন করা। সেই দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় একবিংশ শতকে নারীর অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও সমাজে তাদের লড়াই ভিন্ন রূপ লাভ করেছে। এখনো সমাজে কিছু মানুষ রয়েছে যারা দেবুর ঠাকুমার মতো পেতে চায়,

> "উচ্চশিক্ষিত দুটি মেয়েকে বউ করে এনে চাবকানোর আত্মপ্রসাদ।"[৪]

যারা অন্যের ওপর শাসন করে রাজতন্ত্রের রাজার মতো সুখ পেতে চায়। তাদের মতে চাকরি শুধুমাত্র অর্থোপার্জনের পন্থা মাত্র। সংসারের জন্য ছেলেদের চাকরি করাই যথেষ্ঠ। মেয়েদের চাকরি করা শখ ছাড়া আর কিছু নয়, তা হল বিলাসিতা। তবে অনেক নারী আছে যাদের কাছে চাকরি শুধুমাত্র অর্থোপার্জন নয়, বরং তা তাদের স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন যা নিজের সংকীর্ণতা থেকে মানুষকে বের করে নিয়ে আসে, তৈরি করে আত্মপরিচয়। সেই আত্মপরিচয় তৈরি করার সাহস দেখিয়েছে দেবাদৃতার মা, জেঠি, কাকি, দিদি; এমনকি দেবাদৃতাও সেই দিকেই অগ্রসর হয়েছে। জীবনের নানা পর্যায়ে দেখা যায়, পরিস্থিতির চাপে ছোটো ছোটো ভালোলাগাগুলিকে মানুষ ত্যাগ করে। যেমন- দেবাদৃতার দিদিমা সংসারের

চাপে এবং দেবাদৃতা ব্যর্থতার গ্লানিতে ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়েছিল। এমনকি সমাজে কিছু কিছু সময় দেখা যায় সম্পত্তির লোভে কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ বিকলাঙ্গ মেয়েকে বিয়ে করার পরে তার ওপর অত্যাচার করে অমানুষের পরিচয় দেয়। 'পাগলাস্যার' অসীমচন্দ্র চৌধুরীর বধির ও বোবা বোন সুমা এইরকমই অত্যাচারের শিকার হয়েছিল। এখনো সমাজে যখন কোনো দম্পতির সন্তান হয় না তখন দোষী মনে করা হয় স্ত্রীকে এবং দাগিয়ে দেওয়া হয় 'বন্ধ্যা' শব্দটি। একবারও সমাজ মনে করে না যে, অক্ষমতা পুরুষেরও থাকতে পারে। কারণ সমাজ মনে করে পুরুষের কোন অক্ষমতা থাকতে নেই। সেলিনা হোসেনের 'মতিজান মেয়েরা' গল্পে মতিজানকেও শুনতে হয়েছে তার সন্তান না হওয়ার জন্য দায়ী সে নিজে একা। পুরুষেরা তাদের শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতাকে সকলের সামনে স্বীকার করতে ভয় পায়, এমনকি মেনে নিতে পারে না। অত্যধিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তাদের গ্রাস করে। অপরাজিতার স্বামী মনোময়ের ক্ষেত্রেও সেই ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু অপরাজিতা তার স্বামীকে অন্ধকারে ঠেলে দেয়নি। বরং নিজের কোলে মাথা রেখে স্বামীকে কাঁদার সুযোগ করে দিয়েছে। সাধারণত বলা হয়, ছেলেরা কাঁদে না, কাঁদতে নেই তাদের। কিন্তু এটা কোন যুক্তিসংগত কথা নয়। রক্ত মাংসের মানুষ খুশিতে যেমন হাসে তেমনি দুঃখে কাঁদেও। অতএব পুরুষদের কাঁদার অধিকার রয়েছে। লেখিকা সমাজের ভুল ধারণার প্রতি কটাক্ষ করলেন এবং দেখালেন একটি বন্ধুত্বপূর্ণ, মমতাময় দাম্পত্য জীবনকে, যেখানে স্বামী-স্ত্রী দু-জন দু-জনকে বোঝে গভীরভাবে।

আবার দেখা যায় কারো কোনো শারীরিক অসুস্থতা সৃষ্টি হলে সকলে তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায় এবং শারীরিকভাবে খারাপ অবস্থাকে অসুস্থতা হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু মানসিকভাবে দুর্বল বা মনের রোগকে সমাজ অসুস্থতা হিসেবে মনে করতে চায় না। স্বাভাবিকভাবেই তার চিকিৎসার কথা ভাবতে মানুষ দ্বিধাগ্রস্ত হয়। অপরাজিতাকে নিখুঁত মনোবিশ্লেষণ ক্ষমতা দান করে লেখিকা পাঠককে বুঝিয়েছেন আসলে মনোরোগ অন্যান্য শারীরিক অসুখের মতই একটি অসুখ। রাজর্ষি যখন মনোরোগের কথা জানতে পারে, তখন সে ভয় পেয়েছিল। সেই সময় দেবাদৃতা ও রাজর্ষিকে সাহস দিয়েছে অপরাজিতা। শারীরিক অসুস্থতার চিকিৎসার মতোই শুরু করেছে মনোরোগের চিকিৎসা। সাধারণত সংসারে যেসব বিষয় নিয়ে চরম অশান্তির সৃষ্টি হয়, সেই বিষয়গুলিকে লেখিকা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে পাঠকের সামনে তুলে ধরলেন, যা প্রশংসার দাবি রাখে।

লেখিকা তিলোত্তমা মজুমদার 'নির্জন সরস্বতী' উপন্যাসে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে ফুটিয়ে তুলেছেন জীবনদর্শনকে। উপন্যাসের প্রথমেই দেখা যায়, বাড়ির পরিচায়িকা অমিয়ামাসির কাঁথা বোনা দেখে দেবাদৃতার মনে হয়েছে গভীর মনোযোগ, অধ্যাবসায় দিয়ে অমিয়ামাসি যেন শুধু রঙিন সুতো দিয়ে কাঁথা বুনছে না, বুনছে আসলে ফুল-পাখি-প্রজাপতির স্বপ্ন। জীবনকে দূর থেকে প্রত্যক্ষ করলে বোঝা যায়, মানুষ বাঁচে আসলে স্বপ্নকে আঁকড়ে ধরে। সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার আকাঙ্ক্ষাতেই বয়ে চলে মানুষের জীবন। কঠিন বাস্তব যখন বারবার স্বপ্ন পূরণের পথে বাধা সৃষ্টি করে তখন জীবন হয়ে ওঠে নকশিকাঁথার সুন্দর নকশার ঠিক বিপরীত দিকের জটিল, এলোমেলো, জটপাকানো সুতোর মতো। দেবাদৃতার মনে হয়েছে জীবনটা অঙ্ক খাতার মতো, সেখানে শুধু 'কাটো আর গোল্লা দাও'।[৫] সে বারবার ব্যর্থ হয়ে ভুলে গিয়েছে যে, শুধু 'ক্রস গোল্লা ক্রস ক্রস'[৬] জীবন নয়, অঙ্ক ঠিক হলে সেখানে নম্বরও পাওয়া যায়। জীবনের এই কাটাকুটি খেলা অনন্তকাল ধরে চলতে থাকে এবং সেই খেলা খেলতে খেলতেই মানুষ চেষ্টা করে নতুন করে বাঁচার। সাধনা করে জীবনদেবতার। তবে দেবাদৃতার মা, গণিতের শিক্ষিকা পারমিতা দেবী মনে করেন অঙ্কের ক্ষেত্রে 'ভাবনাটাই' মূল। অঙ্ক ভাবলে যুক্তিবোধ বাড়ে। তবে এই কথাটি অবিশ্বাসযোগ্য যে, শুধুমাত্র অঙ্কই যুক্তিবোধ গড়ে তোলে। প্রত্যেকটি বিষয় সাহিত্য বা বিজ্ঞান মানুষের যুক্তিবোধ গড়ে তুলতে সক্ষম এবং পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। উপন্যাসে উল্লিখিত অঙ্ক শুধুমাত্র খাতার অঙ্ক নয়, তা আসলে জীবনের অঙ্ক। জীবনের হিসাব সবসময় মেলানো যায় না। জীবনের সুখ-দুঃখ, পাওয়া-না পাওয়া, দেওয়া-নেওয়া, উন্নতি-অবনতি সব অঙ্কের উত্তর সবাই মেলাতে পারে না। তা সত্ত্বেও মানুষ যখন নিজের অনুভূতি, সৎ-অসৎ কর্ম, ভালো-খারাপ সবকিছু নিয়ে নিজেই বিচার-বিশ্লেষণ করে তখনই তার মধ্যে গড়ে ওঠে যুক্তিবোধ। মিথ্যে মোহতে না জড়িয়ে সে এগিয়ে যায় অখণ্ড সত্যের দিকে। এই কারণেই পারমিতার মুখ দিয়ে লেখিকা বলেছেন-

> "অঙ্কের দ্বারা মূল্যায়ন হয়। অঙ্কের মূল্যায়ন সম্ভব নয়। কারণ, অঙ্ক সংখ্যাই নয় শুধু। অঙ্ক এক বোধ, প্রকৃতির নিহিত সত্তা।"[৭]

পারমিতা দেবী বলেছেন, প্রেম হল আসলে চোখ দিয়ে হৃদয়ে টেনে নেওয়া। হাজারো মানুষের ভিড়ে যখন দুজন মানুষ একে অপরকে দেখে তখন এক অলৌকিক সূত্রে বাঁধা পড়ে দুটি হৃদয়। ভাবমূর্তি তৈরি হয় দেখার সঙ্গে সঙ্গেই। অথচ তা চোখে দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না, শুধুমাত্র অনুভব করা যায়। পারমিতা দেবীর মতে, অঙ্ক আসলে সেই রকমই। অঙ্ক করতে হয় শূন্যে, যা আসলে দেখা যায় না। কিন্তু তা মানুষের অস্তিত্ব জুড়ে থাকে ঠিক যেন মানুষের 'মন'- এর মতো, যে মনের একটি অংশ হল হৃদয়। এই অঙ্ককে রাস্তা হিসেবে নির্বাচন করে লেখিকা পৌঁছে গিয়েছেন আরো গভীর দার্শনিক বিশ্লেষণে। দেবাদৃতা তার মাকে প্রশ্ন করেছে –

> "মন যদি শূন্য হয় মা, হৃদয় কি তবে শূন্যের অংশ? শূন্যের কি অংশ হয় মা?"[৮]

লেখিকার উক্তিকে বিশ্লেষণ করে বলা যায়, শূন্য আসলে অসীম অনন্ত সর্বব্যাপী। শূন্য হল একটি একক। মহাবিশ্ব যদি মহাশূন্যের একটি অংশ হয়, তবে মহাবিশ্বকে মহাশূন্যের সঙ্গে মিলিত হতেই হবে। আসলে শূন্য কখনো শূন্য থাকে না। সীমাহীন সর্বব্যাপী সত্তাকে যদি শূন্য বলেই মনে করা হয়, তবুও মনে রাখতে হয় মহাবিশ্ব সেই সত্তারই একটি অংশ। যা শূন্য তার মধ্যেও উপাদান থাকে। আত্মা যদি পরমাত্মার অংশ হয় এবং পরমাত্মা যদি হয় সেই সীমাহীন সর্বব্যাপী সত্তা, তবে আত্মাকে শেষ পর্যন্ত মিলিত হতে হয় সেই সত্তার সঙ্গে। অর্থাৎ পুঞ্জিভূত আত্মা এক দেহে লীন হয়। স্বাভাবিক ভাবেই শূন্যতা শূন্য হয়ে থাকে না। আবার যদি উদাহরণ হিসেবে মনে করা হয় একটি সম্পর্ককে, যেখানে দুটি হৃদয় একত্রে মিলিত হয়। সেই সম্পর্ক যদি কোনো কারণে ভেঙ্গে যায়, তবে সৃষ্টি হয় এক শূন্যতা। সেখানে বাহ্যিকভাবে দেখা যায় দুটি মানুষের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু সেই শূন্যতায় রয়ে যায় অনেক অনুভূতি, স্মৃতি– যা ব্যাখ্যাতীত। তাই শূন্যতায় যদি কোন কিছুর শেষ হতে পারে, তবে শূন্য থেকেই সৃষ্টি হতে পারে নতুন জগৎ।

লেখিকা অপরাজিতার বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পর্ক ও ভালোবাসাকে দেখিয়েছেন। লেখিকার বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করে বলা যায়, জন্মসূত্রে মানুষ পরিবারের অন্তর্গত সম্পর্কগুলিকে বুঝতে শেখে। কিন্তু চেনা জগতের বাইরে অবস্থিত সম্পর্ককে বাইরে থেকে ভেতরে আনতে হয়। সেই সম্পর্কের ভিত্তিভূমি দুর্বল হলে তা ভেঙে যায়, আবার সঠিক পরিচর্যায় কোন সম্পর্ক চিরন্তনতা লাভ করে। সম্পর্কের মৌলিক উপাদান তিনটি- পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও বিশ্বাস। সম্পর্কের মন্দিরসম ঘরে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস কষ্ট করে হলেও নিয়ে আসা যায়, কিন্তু ভালোবাসা নিয়ে আসতে প্রয়োজন হয় অনেক সময়। কারণ ভালোবাসা হল একান্ত নিজস্ব অনুভূতি, যা হৃদয়ে, আত্মায়, চিন্তনে নিমজ্জিত থাকে। সমুদ্রের মতো যার বিস্তৃতি। যে অনুভূতি একান্ত নিজস্ব। ভালোবাসা ঠিক যেন সমুদ্রে নিমজ্জিত পাহাড়ের মতো, যে অংশটি চক্ষুগোচর হয় তার থেকেও অনেক গভীর হয় চোখের অন্তরালে থাকা নিমজ্জিত অংশটি। দৈন্য, সুন্দর, অসুন্দর কিছুর দ্বারাই ভালোবাসা প্রভাবিত হয় না। সেখানে ক্ষমা করা যায় সহজেই। কিন্তু খুবই সংবেদনশীল এই অনুভূতি। সামান্য আঘাতে যার ওপর গভীর ক্ষত হয়। ভালোবাসা আসলে কি তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে লেখিকা লিখেছেন, যখন জলে চুন গোলা হয় তখন প্রথম আলোড়নে জলের ওপর দুধের মত সাদা স্তর সৃষ্টি হয়। তারপরে যখন আলোড়নের গতি বেড়ে যায় তখন সাদা চুন জলের নিচে থিতিয়ে পড়ে। মুগ্ধতার মিশ্রণ, জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের আলোড়নের শেষে টলটলে জলের মতো উঠে আসে ভালোবাসা। মানুষের মন নিয়ত পরিবর্তনশীল। তাই ভালোবাসার পরীক্ষা হয়ে চলে প্রতিনিয়ত। বর্তমান সময়ের অধিকাংশ যুবক-যুবতী ভালোবাসা নামে যেরূপ সংকীর্ণতাকে বুঝতে শুরু করেছে, সেইরকম পরিস্থিতিতে লেখিকা ভালোবাসার যে বৃহৎরূপ দেখিয়েছেন তা বর্ষাকালের জোৎস্না রাতের মতো পাঠককে কাঁদায়-হাসায়, পাঠককের হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করে।

ভালোবাসার সম্যক উপলব্ধি আসলে জীবনদর্শন। সাধারণভাবে বলা হয়, যেখানে বিজ্ঞানের শেষ সেখানেই দর্শনের শুরু। কিন্তু অপরাজিতার মতে, মানুষ আগে চিন্তা ও কল্পনার মধ্যে দিয়ে কার্যকারণ সম্পর্ক অবধারণ করে। চিন্তনের পরবর্তী প্রায়োগিক পর্ব হল বিজ্ঞান। দর্শন ও বিজ্ঞান পরস্পরের হাত ধরে চলে। দর্শন হল নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহমান চিন্তন

প্রক্রিয়া এবং বিজ্ঞান চলে তাকে অনুসরণ করে। জীবনদর্শনে সমস্ত কিছুই আসলে এক বোধ। লেখিকার এইরকম দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থনযোগ্য ও প্রসংসাযোগ্য।

তিলোত্তমা মজুমদারের 'নির্জন সরস্বতী' উপন্যাসটি নিবিড়ভাবে পাঠ করলে বোঝা যায়, নামের মধ্যে গুপ্ত অবস্থায় রয়েছে উপন্যাসের মূলসূত্র। 'সরস্বতী' শব্দটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় দেবাদৃতার পিসীঠাকুমার মুখে। দেবুর জেঠিকে যখন তার ঠাকুমা ডাক্তারি করতে যেতে দেননি তখন সেই মহিলা প্রতিবাদ করে বলেন, চাকরি করে টাকা উপার্জন করাটাই সব নয়–

"দেবী সরস্বতী পুজো পাবে না? বিদ্যা প্রয়োগ না হলে অধর্ম হয়।"[৯]

অর্থাৎ শুধুমাত্র বিদ্যা অর্জন নয়, বিদ্যার সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে আরাধ্যা দেবীকে অর্ঘ্য দান করতে হয়। বিদ্যা প্রয়োগের মাধ্যমে দেবীর আরাধনার বিষয়টি লেখিকা দেবাদৃতার মা, জেঠি, দিদি প্রভৃতি চরিত্রের মাধ্যমে অসাধারণ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। দেবুর মা পারমিতা দেবী জীবনে যা পাননি তা নিয়ে আক্ষেপ না করে, যা পেয়েছেন তা নিয়েই জীবনের সাধনা করে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন–

"অতীত দুর্বোধ্য, ভবিষ্যৎ অজ্ঞেয়। যা বর্তমান, তারই মধ্যে আনন্দ ও সৌন্দর্য খুঁজে নিতে হয়।"[১০]

তার এই গভীর আত্মোপলব্ধি আসলে দীর্ঘদিন যাবৎ দেবী সরস্বতীর উদ্দেশ্যে সাধনার ফল। তিনি শুধুমাত্র পুস্তকেই দেবী স্বরস্বতীর অস্তিত্ব অনুভব করেননি। বরং সেই আরাধ্যা দেবীকে দেখেছেন জীবনের প্রত্যেক অধ্যায়ের মধ্যে।

দেবাদৃতা 'নির্জন সরস্বতী' শব্দটি প্রথম শুনেছিল সুভাষগ্রামে পাগলাস্যারের সন্ধানে গিয়ে ভ্যানচালক জয়নাথের মুখে। তিনি ইচ্ছানুযায়ী সারেঙ্গী বাজিয়ে নিজের হাতে তৈরি সরস্বতী মূর্তির একান্তে সাধনা করতেন। তাকে তার মা বলত 'একলাষেঁড়ে'- এই শব্দটির বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। নির্জনতাকে নির্দেশ করে শব্দটি। বারুইপুর থেকে প্রকাশিত একটি খবরের কাগজে 'নির্জন সরস্বতী' নামে তার সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখা হয়। তার ভাষাতেই লেখিকা দেবাদৃতা তথা পাঠককে বুঝিয়েছেন কত বড় হয় সাধনার জগৎ। 'কর্মই সাধনা, কর্মই পরিচয়'।[১১] সে বলে জীবনের সব কাজই একরকমের সাধনা। গভীরভাবে ভাবলে দেখা যায়, যথার্থ মনোনিবেশ ও দক্ষতার মধ্য দিয়েই দৈনন্দিন জীবনযাপনের প্রত্যেকটি কাজ সুন্দর হয়ে ওঠে। সেই দিক থেকে বিচার করলে লেখিকার এই ভাবনা যথার্থই সুন্দর।

Sudha Murty (জন্ম ১৯৫০)-এর 'A Lesson Life From A Begger' ছোটোগল্পে নেতিবাচক ভাবনায় নিমজ্জিত মীনা যেমন একজন ভিক্ষুককে বৃষ্টিতে ভেজার মতো সাধারণ ঘটনায় জীবনের আনন্দ লাভ করতে দেখে আত্মোপলব্ধির দ্বারা নিজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়েছিল, তেমনই ব্যর্থতার অন্ধকারে হারিয়ে যেতে যেতে দেবু আলোর সন্ধান পেল অসীমচন্দ্র চৌধুরীর বাড়ি গিয়ে,যাকে সাধারণলোকে বলে 'পাগলাস্যার'। সেখানে গিয়ে প্রথমেই দেবাদৃতার সঙ্গে দেখা হয় রাজর্ষি দাশগুপ্তের। দু-জনেই আকর্ষণবোধ করে দু-জনের প্রতি। দু-জনের জীবনে নিজেকে জানার প্রবল আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়। ক্রমশ আত্মোপলব্ধির সাধনায় তারা নিজেদের আবিষ্কার করে। বই ও প্রেম কীভাবে আত্মোপলব্ধির দ্বারা মানুষের জীবনের পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম তা লেখিকা দেখিয়েছেন এই উপন্যাসে। অসীমচন্দ্র স্যার তাকে পড়াশোনার জন্য চাকরি ছাড়তে বলেন। কারণ তপস্যা নির্জনে বসে একাগ্রচিত্তে করতে হয়। নির্জন নিবিড় সাধনায় সরস্বতীর আলোকদীপ্ত রূপ দেবু দেখতে পেয়েছিল অসীমচন্দ্র চৌধুরীর গুরুমন্ত্রে। তিনি বলেছেন, মনের দুটি কক্ষ তৈরি করে কাছের মানুষদের একটি কক্ষে রাখতে হয়। যারা দুঃখ ও সুখ দিতে পারে। এই কক্ষের দ্বার প্রয়োজনানুসারে ব্যবহার করতে হয়। আর মনের অন্য কক্ষ সরস্বতীর পদতলে জলাঞ্জলি দিয়ে দিতে হয়। সরস্বতী বাস করেন শিক্ষা, অনুশীলন, প্রয়োগ এবং নিত্যনতুন প্রগতির জ্ঞানের মধ্যে। জীবনে যতই আলোড়ন সৃষ্টি হোক, তবুও অবিচলিত হয়ে সাধনা করে যেতে হয়। লেখিকার উল্লেখিত এই সাধনা পদ্ধতি জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ। দেবাদৃতা যেমন সি.এ পরীক্ষার জন্য পড়া শুরু করেছে তেমনি রাজর্ষির মানসিক অসুস্থতা দূর করার প্রয়াসও শুরু করেছে। সামগ্রিকভাবে জীবনের সাধনায় সে মগ্ন হয়েছে। এমনকি দেখা যায় দেবাদৃতাকে লেখিকা 'আলোর সরস্বতী'ও বলেছেন এবং তার বাহন হিসেবে কলহংসের মতো ধবধবে মসৃণ গাড়ির কথা উল্লেখ করেছেন। তবে বাস্তবকে সামনে

রেখে এই কথাও মনে রাখতে হয় সকলের কাছে জ্ঞানার্জন সাধনা নয়। বরং বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় পড়াশোনা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। গুরু-শিষ্য হয়ে উঠেছে বিক্রেতা ও ক্রেতা, নোট যেখানে পণ্যবস্তু।

ভ্যানচালক তথা সাধক জয়নাথ তার মাটির ঘরে প্রতিষ্ঠিত নির্জন সরস্বতীকে গড়েছিলেন নতুন রূপে। মূর্তির দেহ কুমোরপাড়ার প্রতিমাশিল্পীর দক্ষ হাতের নারীর যৌবন নয়। এ মূর্তি যেন অন্ধকারের মধ্যে আলো বিচ্ছুরণকারী চতুর্ভূজা দেহাবয়ব মাত্র। মেয়েরা ঘরের দেওয়ালে থুপে থুপে ঘুঁতে দেওয়ার সময় যেমন গোময় মিশ্রণে থেকে যায় আঙ্গুলের ছাপ তেমনভাবে কাদামাটি ও কলিচুন মিশিয়ে নির্মিত হয়েছে মূর্তিটি। একতারাবাদিনী দেবীর ঠোঁটে দেখা যায় অপূর্ব হাসির আভা যা সাধককে সাধনার শক্তি দেয়। সাধারণ জনজীবনে যেসব সরস্বতী মূর্তি দেখা যায়, সে মূর্তি অপরূপা সুন্দরী। ভেতরের জ্ঞানের বিচ্ছুরণের থেকে রূপের ঔজ্বল্য বেশি প্রাধান্য পায়। সেই মূর্তিতে ফুটে ওঠে সমাজের চিরাচরিত সৌন্দর্য। তার পেছনে থাকে অসুন্দরের ছাপ। আভিজাত্যের প্রতীক স্বরূপ তার হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয় বীণা। কিন্তু সত্যিকারের বাস্তব সমাজের প্রেক্ষিতে লেখিকা দেবী সরস্বতীকে গড়ে তুললেন জয়নাথের হাত দিয়ে। আভিজাত্যের বীণা নয়, মাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত একতারাকে তুলে দিলেন তিনি দেবীর হাতে। দেবীর শরীরে যে আঙুলের ছাপ তা আসলে সমাজের নোংরা মানসিকতার মানুষের আঙুলের ছাপ। মানুষের মধ্যে থেকে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে সত্যের জ্ঞান, শিক্ষা। সমাজে যে নারী দেবী রূপে পূজিত হন, সেই নারীকেই অপমানিত, লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত হতে হয়। তাই জয়নাথের গড়ে তোলা দেবী সুন্দরী নন। তার সৌন্দর্য হরণ করেছে পাষণ্ড সমাজ। রাজর্ষিকে সুস্থ করার জন্য দেবাদৃতা স্বামীর সঙ্গে সঙ্গমের পরে সেই অবস্থাতেই কান ধরে ওঠ বোস করতে বাধ্য হয়। সে স্বামীকে সুস্থ করে তোলার জন্য সাধনা করে। কারণ সে ভালবাসে রাজর্ষিকে। বি-বাহ অর্থাৎ বিশেষরূপে বহন করা। তারা দু-জন মন ও শরীরের যাবতীয় সুন্দর-অসুন্দর, জয়-পরাজয় আঘাত-পুরস্কার সবকিছুর সঙ্গী। ভালোবাসার জগৎ অনেক বড়। ভালোবাসায় পরিস্থিতি সাপেক্ষে স্ত্রী হয়ে ওঠে মা, বোন, বান্ধবী আর স্বামী হয়ে ওঠে বাবা, দাদা, বন্ধু। এই ভালোবাসা শুধু সুখের নয়, আনন্দের নয়। ভালোবাসায় শাস্তিও থাকে –

> "অসীম অকুল দুঃখসমুদ্রের অশেষ সন্তরণ!"[১২]

তাদের এই দুঃখ-কষ্টের কারন অন্ধকারে নিমজ্জিত সমাজ। তাই লেখিকা বলেছেন,

> "এই নিষ্ঠুর বধ্যভূমিতে যেখানে থাকে মিথ্যাচার ও ছলনা, ধর্ষণ ও প্রতারণা, হিংসা ও দ্বেষ, স্বার্থান্বেষ; যার ফলে শাস্তি পায় ভালোবাসা সেখানে 'স্বয়ং বিদ্যার দেবী সরস্বতী দু'হাতে দু'কান স্পর্শ করে দাঁড়িয়ে থাকেন একাকিনী।"[১৩]

কারণ মনুষত্বহীন, মানবিকতাহীন মানুষের আচরণ তিনি আর সহ্য করতে পারেন না। অথচ যারা শত কষ্ট পেয়েও দেবীর সাধনা করে যায় তারা দেখতে পায় দেবীর ঠোঁটের দিব্য হাসি। এই হাসিই তাদের নির্জন সাধনার দিকে এগিয়ে নিয়ে চলে। এইভাবেই মানুষ নিজের জীবনের সাধনা করে চলে জ্ঞানপ্রদায়িনী, দিকদর্শনকারী দেবীর। দেবী নিজেও দাঁড়িয়ে থাকেন একা এবং তার সাধকও একাই জীবনের পথে হেঁটে চলে। সমগ্র আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় 'নির্জন সরস্বতী' ব্যঞ্জনাধর্মী নামকরণটির বিশেষ তাৎপর্য ফুটে উঠেছে উপন্যাসে।

'নির্জন' অর্থাৎ যেখানে পাশে কেউ থাকে না। নির্জনতার মধ্যে লুকিয়ে থাকে একাকীত্ববোধ। এই 'একাকীত্ব' শব্দটিকে নেতিবাচক শব্দ মনে হলেও যখন 'নির্জন' শব্দের হাত ধরে 'সাধনা' তখন দুটি শব্দ আরো বেঁধে বেঁধে অবস্থানের মাধ্যমে আলোকময় করে তোলে অন্ধকারে নিমজ্জিত মানুষের জীবন। বর্তমান সমাজের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে 'নির্জন সরস্বতী' উপন্যাসে। দেবাদৃতা, শুভায়ন, শ্রাবণী প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে বাস করে নাম না জানা অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী। যারা জানে চাকরির পরীক্ষায় বারবার অসফল হওয়ার যন্ত্রণা, প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যাওয়ার পরেও বাবার অর্থে দিন চালানোর আত্মগ্লানি, বাবা-মায়ের মুখে হাসি ফুটিয়ে না তুলতে পারার কষ্ট, মেয়েদের ক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে বিয়ে করে মিথ্যে সুখে নিজেকে ভোলানোর দুঃখ বা ছেলেদের ক্ষেত্রে নিজের অযোগ্য কাজে যোগদান করার যন্ত্রণা। চাকরির পরীক্ষায় অসফল হওয়ার কারণ শুধুমাত্র তারা নিজে নয়, তার জন্য অনেক ক্ষেত্রে দায়ী থাকে কর্তৃপক্ষ। যারা ছাত্র-ছাত্রীকে পাস করাতে চায় না। অমানসিক যন্ত্রণায় ছাত্র-ছাত্রী অন্ধকারে ডুবে যায়। কিন্তু তিলোত্তমা মজুমদার অন্ধকার

থেকে আলোর পথ দেখালেন তাঁর উপন্যাসে। তাই এই উপন্যাসে রসগ্রাহী পাঠক নানা চরিত্রের মধ্যে যেমন খুঁজে পাবে নিজেকে, তেমনি আত্মোপলব্ধির দ্বারা বলতে পারবে 'আমি হার মানবো না।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে মৃণাল যেমন আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে 'আমার মুক্তি' খুঁজে পেয়েছিল সংসারের সংকীর্ণতা থেকে নিজেকে বের করে নিয়ে গিয়ে; বা 'আমার জীবন' গ্রন্থের লেখিকা রাসসুন্দরী দাসী আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করেছিল, 'কলুর বলদ'-এর মতো সংসারের ঘানি টেনে নিয়ে যাওয়াই জীবন নয়; তেমনই আত্মোপলব্ধির মাধ্যমেই জীবনের সঠিক দিশা খুঁজে পেয়েছিল দেবাদৃতা। তিলোত্তমা মুজমদার 'নির্জন সরস্বতী' উপন্যাসে দেবাদৃতার জীবনের মধ্যে দিয়ে পাঠককে দেখালেন সাধনার একটি বৃহৎ রূপ। বিদ্যার দেবী সরস্বতী শুধুমাত্র বিদ্যার দেবী নন, তিনি আসলে জীবনদেবতা। মানুষ তার সাধনা করে চলে জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে। সেই সাধনা দ্বারা মোক্ষলাভ মানুষের পরম উদ্দেশ্য। মোক্ষ অর্থাৎ যেখানে মানুষ শান্তি লাভ করে। জীবনের ছোট ছোট সাধনায় জয়-পরাজয় হতে হতেই মানুষ এগিয়ে চলে সিদ্ধিলাভের দিকে।

তথ্যসূত্র :

১. মজুমদার, তিলোত্তমা, 'নির্জন সরস্বতী', কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ২০১৯, প্রচ্ছদ
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতেশ, 'সওদাগরের নৌকা', চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, পৃ. ১১৪
৩. বিবেকানন্দ, স্বামী, https://www.artic.edu/swami-vivekananda-and-his-1893-speech
৪. মজুমদার, তিলোত্তমা, "নির্জন সরস্বতী", 'দেশ' শারদীয়, ১৪২৫, পৃ. ১৬৫
৫. তদেব, পৃ. ১৬৪
৬. তদেব, পৃ. ১৬৪
৭. তদেব, পৃ. ১৬৪
৮. তদেব, পৃ. ১৬৮
৯. তদেব, পৃ. ১৬৫
১০. তদেব, পৃ. ১৬৮
১১. তদেব, পৃ. ১৭৬
১২. তদেব, পৃ. ২০৫
১৩. তদেব, পৃ. ২০৫

গ্রন্থপঞ্জি :

(ক) আকর গ্রন্থ :

১. তিলোত্তমা মজুমদার, "নির্জন সরস্বতী", 'দেশ' শারদীয়, ১৪২৫

(খ) সহায়ক গ্রন্থ :

১. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, কুড়ি একুশ শতকের নারী ঔপন্যাসিক, কলকাতা আশাদীপ, ২০১৪
২. অশ্রুকুমার সিকদার, 'আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস', কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী, ২০০৩
৩. ড. সুশীল ভট্টাচার্য, 'বাংলা উপন্যাসের ক্রমবিকাশ', ২য় খন্ড, কলকাতা সাহিত্যশ্রী, ২০১৯

(গ) অন্তর্জাল :

১. https://www.artic.edu/swami-vivekananda-and-his-1893-speech
২. https://youtu.be/k2RU2ykc9O4